আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন বা মি'রাজ (الإِسْــرَاءُ وَالْمِعْــرَاجُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন বা মি'রাজ (الإِسْــرَاءُ وَالْمِعْــرَاجُ)

নাবী কারীম (ﷺ)-এর তাবলীগ ও দাওয়াতের কৃতকার্যতা এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের মধ্য পর্যায়ে অতিক্রম করে চলছে। সুদূর আকাশের প্রান্তে আশার ক্ষীণ আলো এবং ধূলিযুক্ত ঝলক দৃষ্টি গোচর হতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এমন সময়ে নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমনের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। (একে আরবী ভাষায় বলা হয় মি’রাজ এবং এ নামেই ঘটনাটির সমধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে)।

মি’রাজের এ বিশ্ববিশ্রুত অলৌকিক ঘটনাটি কোন্ সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল,

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল সে বছর মি’রাজ সংঘটিত হয়েছিল (এটা তাবারীর কথা)।

২. নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর মি’রাজ সংঘটিত হয়েছিল (ইমাম নাবাবী এবং ইমাম কুরতুবী এ মত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেছেন)।

৩. দশম নবুওয়াত বর্ষের ২৭শে রজব তারীখে মি’রাজ সংঘটিত হয়েছিল। (আল্লামা মানসুরপুরী এ মত গ্রহণ করেছেন)।

৪. হিজরতের ষোল মাস পূর্বে, অর্থাৎ নবুওয়াত দ্বাদশ বর্ষের রমযান মাসে মি’রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৫. হিজরতের এক বছর দু’মাস পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের মুহারম মাসে মি’রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৬. হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের রবিউল আওয়াল মাসে মি’রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি মত এ জন্য সহীহুল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না যে, উম্মুল মু’মিনীন খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বে। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে সকলেই এক মত যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়েছে মি’রাজের রাত্রিতে। কাজেই, এ থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল মি’রাজের পূর্বে। তাছাড়া, এটাও সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দশম নবুওয়াত বর্ষের রমাযান মাসে। এ প্রেক্ষিতে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মি’রাজের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে, পূর্বে নয়।

অবশিষ্ট থাকে শেষের তিনটি মত। এ তিনটির কোনটিকেই কোনটির উপর অগ্রাধিকার দানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সূরাহ ‘ইসরার’ বর্ণনাভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কা জীবনের শেষ সময়ে।[1]

হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনার যে বিস্তারিত রিওয়ায়াত প্রদান করেছেন পরবর্তী পঙ্ক্তিগুলোতে তার সার সংক্ষেপ

লিপিবদ্ধ করা হল :

ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সশরীরে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবরাঈল (আঃ) মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পর সেখানে সমাগত নাবীগণ (আঃ)-এর জামাতে ইমামত সহকারে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাঁকে বুরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম আসমানের দরজা খোলা হল সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। জিবরাঈল (আঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, 'ইনি হচ্ছেন আপনার আদি পিতা আদম (আঃ)। একে সালাম করুন। এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে শ্রদ্ধাভারে সালাম জানান। আদম (আঃ) আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'খোশ আমদেদ!' হে বংশের মধ্যমণি! খোশ আমদেদ! হে আমার বংশের গৌরব!' তারপর তিনি তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাগণের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাগণের আত্মাসমূহ তাঁকে প্রদর্শন করালেন।

এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খোলা হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় পর্বের পর তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। উভয়েই সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারাকবাদ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদরীস (আঃ)-কে দেখেন এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

পঞ্চম আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন ইমরান (আঃ)-কে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি যথারীতি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

তারপর রাসূলে কারীম (ﷺ)-কে ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মুসা বিন ইমরান (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন। মুসা (আঃ) সম্ভ্রমের সঙ্গে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ যখন সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, 'আমার পূর্বে এমন এক যুবককে নাবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যাঁর উম্মতগণ আমার উম্মতদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেন।''

অগ্রযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর সঙ্গে, তিনি (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)) তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিও সসম্ভ্রমে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হয়। তথাকার কূল বৃক্ষের এক একটা ফল 'হাজার' অঞ্চলের

কুল্লাহ'র ন্যায়। আর তার পত্র-পল্লবগুলো হাতির কানের মতো। অতঃপর সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি, জ্যোতি ও বিভিন্ন বিচিত্র রং আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে তা এমন রুপে পরিবর্তিত হলো যে, কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

চলার শেষ পর্যায়ে তাঁকে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বায়তুল মা'মূর এমন এক ঘর যাতে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে। অতঃপর তারা আর সেখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে না। এরপর তিনি (ﷺ) জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে মোতি নির্মিত রশি, জান্নাতের মাটি হলো মেশক নামক সুগন্ধির তৈরী। অতঃপর তাঁর নিকট এমন বিষয় পেশ করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস শব্দ শুনতে পান।

তারপর এ বিশ্বের মহা গৌরব, চির আকাঙ্ক্ষিত মানব নাবী, দোজাহানের মহাসম্মানিত সম্রাট, তাজদারে মদীনা, নাবীকুল শিরোমণি, রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন্নাবিয়ীন নীত হলেন অনাদি অনন্ত, অবিনশ্বর, অসীম শক্তি-সামর্থ্য ও হিকমতের মালিক আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। পর্দার একপাশে চির বিশ্ব জাহানের চির আরাধ্য, চির উপাস্য, অদ্বিতীয় স্রষ্টা প্রতিপালক প্রভূ, অন্যপাশে তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রিয়তম নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ), মধ্যখানে রয়েছে দু'ধনুকের জ্যার সমপরিমাণ ব্যবধান কিংবা তার চাইতেও কম। অনুষ্ঠিত হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকার, অশ্রুত পূর্ব সম্মেলন। অত্যন্ত প্রতাপান্বিত স্রষ্টা প্রভূ এবং মনোনীত প্রিয়তম সৃষ্টির মধ্যে হল আল্লাহর বাণী বিনিময়। তোহফা স্বরূপ বরাদ্দ করা হল পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাত।

এরপর শুরু হল নাবীজী (ﷺ)-এর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তনের পালা। এক পর্যায়ে সাক্ষাৎ হল মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে। উত্তরে নাবী কারীম (ﷺ) বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের কথা।

উত্তরে মুসা (আঃ) বললেন, 'আপনার উম্মতের পক্ষে সম্ভব হবে না পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। আপনি ফিরে গিয়ে আপনার উম্মতের উপর আরোপিত এ গুরু দায়িত্ব হালকা করে নেয়ার জন্য আল্লাহর সমীপে আবেদন পেশ করুন।

এ কথা শ্রবণের পর জিবরাঈল (আঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জিবরাঈল (আঃ) ইঙ্গিতে বুঝালেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। এরপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে গেলেন, তিনি নিজ স্থানেই ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় সহীহুল বুখারীতে এ কথা আছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নীচে আনা হল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মুসা (আঃ)-এর নিকট আগমন করে দশওয়াক্ত কমানোর কথা বললেন, তখন তিনি পুনরায় পরামর্শ দিলেন আল্লাহর সমীপে ফিরে গিয়ে এ গুরুভার আরও লাঘব করার জন্য আরও আবেদন পেশ করতে। শেষমেষ পাঁচওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত মুসা (আঃ) এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দু'মঞ্জিলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাতায়াত অব্যাহত থাকল। শেষ দফায় যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেয়া হল তখনো মুসা (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পরামর্শ দিলেন পুনরায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে গিয়ে আরও কিছুটা হালকা করে নেয়ার জন্য। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'এ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পুনরায় যেতে আমি খুবই লজ্জাবোধ করছি। অত্যন্ত সন্তুষ্টির সঙ্গে আমি দিন ও রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত

ফরজ সালাতের সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম।’ এ বলে তিনি সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললেন। যখন তিনি বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করলেন তখন নিম্নোক্ত কথাগুলো তাঁর শ্রুতিগোচর হল।

‘‘আমি আমার বান্দাদের জন্য আপন ফরজ জারী করে দিলাম এবং বান্দাদের দায়িত্বভার কিছুটা হালকা করে দিলাম।[2]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপন প্রভূকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন কিনা সে ব্যাপারে ইবতুল কাইয়্যেম মতভেদ বর্ণনা করেছেন। এরপর ইবনে তাইমিয়ার এক সূক্ষ্ম বর্ণনার আলোচনা করেছেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে ‘আল্লাহকে চাক্ষুস দেখার কোন প্রমাণ নেই।’ কোন সাহাবীও এরকম কোন কথা বলেন নি। আর ইবনে আব্বাস থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখার এবং অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার যে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে প্রথতুটি দ্বিতীয়টির বিপরীত নয়।

এরপর ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন, সূরাহ নাজমে আল্লাহ তা‘আলার যে ইরশাদ,

(ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى) [النجم : 8]

‘‘তারপর সে (নাবীর) নিকটবর্তী হল, তারপর আসল আরো নিকটে,’ (আন-নাজ্ম ৫৩ : ৮)

‘তৎপর সে নিকটে আসল এবং আরও নিকটে আসল।’ এটা ঐ নৈকট্য থেকে ভিন্ন যেটা মি’রাজের ঘটনায় ঘটেছিল। কেননা, সূরাহ নাজমে যে নৈকট্যের উল্লেখ রয়েছে তাতে জিবরাঈল (আঃ)-এর নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। যেমনটি ‘আয়িশাহ সিদ্দীকা (রাঃ) এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন এবং বর্ণনা ভঙ্গিতেও এটাই নির্দেশিত হচ্ছে। এর বিপরীত মি’রাজের হাদীসে যে নৈকট্য লাভের কথা বলা হয়েছে তাতে সর্বশক্তিমান প্রভূ আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সূরাহ নাজমে একথার কোন উল্লেখ নেই। বরং তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট এবং তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুবার তাঁকে তাঁর আসলরূপে দেখেছিলেন। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।[3] এ সম্পর্কে সঠিক কী, সেটা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন।

এ সময় পুনরায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং এ সফরকালে তাঁকে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল। তাঁর সম্মুখে দুধ ও মদ পেশ করা হয়েছিল। তিনি দুধ পছন্দ করেছিলেন। এতে তাঁকে বলা হয়েছিল ‘আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে আর আপনি যদি মদ গ্রহন করতেন তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। তিনি জান্নাতে চারটি নদী দেখেছিলেন। এর মধ্যে দুটি প্রকাশ্যে এবং দুটি গোপন। প্রকাশ্য দুটি হচ্ছে নীল ও ফোরাত। সম্ভবতঃ এর তাৎপর্য এই ছিল যে, তাঁর রেসালাত নীল ও ফোরাত নদের শস্য শ্যামল এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতি ঘটাবে এবং এখানকার মানুষ বংশপরম্পরা সূত্রে মুসলিম হবে। ব্যাপারটি এ নয় যে, এ দু’পানির উৎস জান্নাত থেকে উৎসারিত হচ্ছে। অবশ্য আল্লাহই সব কিছু ভাল জানেন। তিনি জাহান্নামের মালিক এবং দারোগাকেও দেখেছেন। তাঁরা হাসছিলেন না এবং তাঁদের মুখমণ্ডলে আনন্দ এবং প্রফুল্লতাও ছিল না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন।

তিনি তাদেরকেও দেখেছিলেন যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে চলেছে। তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি উটের ঠোঁটের মতো। তারা পাথরের টুকরোর মতো আগুনের ফুলকি মুখের মধ্যে পুরছিল এবং সেগুলো গুহ্যদ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে আসছিল।

তিনি সুদখোরদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের পেটগুলো এতই প্রকান্ড আকারের ছিল যে, পেটের ভার বহন করা ছিল তাদের জন্য খুবই কষ্টকর ব্যাপার এবং পেটের ভারে এদিক ওদিক নড়াচড়া তাদের পক্ষে ক্রমেই সম্ভব হচ্ছিল না। অধিকন্তু, ফেরাউনের বংশধরগণকে যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের জন্য পেশ করা হচ্ছিল তখন তারা এদেরকে পদদলিত করে অতিক্রম করছিল।

এক পর্যায়ে তিনি ব্যভিচারীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের সম্মুখে টাটকা ও মোটা গোস্ত ছিল এবং তার পাশে দুঃসহ দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস ছিল। এরা টাটকা ও মোটা গোস্ত বাদ দিয়ে পচা গোস্ত খাচ্ছিল।

তিনি সেই সকল স্ত্রীলোকদেরকেও দেখেছিলেন যারা স্বামীদেরকে অন্যের ঔরষ জাত সন্তান প্রদান করত। (অর্থাৎ তারা ছিল ব্যভিচারিণী, ব্যভিচারের কারণে তারা পর পুরুষের বীর্যে গর্ভ ধারণ করত কিন্তু স্বামীর অজানতে সে সন্তান স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিত)। তিনি দেখলেন তাদের বক্ষস্থল বড় বড় বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

যাতায়াতের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরববাসীদের এক বণিক দলকেও দেখেছিলেন এবং তাদের এক পলাতক উট দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের পানিও পান করেছিলেন। ঐ পানি একটি পাত্রে ঢাকা ছিল। এ সময়ে বণিকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। পানি পান করার পর পুনরায় তিনি পাত্রটিকে ঢেকে রেখেছিলেন। মি’রাজের রাত্রিশেষে সকাল বেলা এ ঘটনাটি তাঁর (ﷺ) দাবীর সত্যতা প্রমাণার্থে দলিল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।[4]

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, ‘যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকালবেলায় স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তারা এ সব কিছুকে মিথ্যা এবং বাজে গল্প বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁর প্রতি যুলম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে থাকে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে এবং উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রশেণর জবাব দিতে থাকেন। এর ফলে নির্দ্বিধায় তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তারা তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি।

অধিকন্তু যাতায়াতের সময় তাদের যে কাফেলা তিনি দেখেছিলেন তার আগমনের সময় এবং বিবরণ ও তিনি বর্ণনা করে শোনালেন। এমন কি কাফেলার অগ্রগামী উটের চিহ্নও তিনি বলে দিলেন। তাছাড়া কাফেলার যে যা কিছু বলেছিল সবকিছুই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ মুশরিকগণ এ সব কিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইল না।[5]

পক্ষান্তরে আবূ বাকর (রাঃ) এ সব কথা শোনামাত্র একে সত্য বলে মেনে নেন এবং এর সত্যতার ঘোষণা দিতে থাকেন। এ সময়ে আবূ বাকর (রাঃ) কে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কারণ, সকলে যখন এ ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল তখন তিনি একে সর্বান্তঃকরণে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।[6]

মি’রাজের প্রসঙ্গ এবং উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে সব চাইতে সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে,

(لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا) [الإسراء: 1]

“এ জন্য যে, আমি (আল্লাহ তা‘আলা) তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাব।’ (আল-ইসরা ১৭ : ১)

নাবী (আঃ)-দের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার এটাই নীতি। সূরাহ আনআমে বলেছেন,

(وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ) [الأنعام:75]

“ এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।’ (আল-আন‘আম ৬ : ৭৫)

তারপর আল্লাহ মূসাকে বললেন,

(لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى) [طه:23]

‘যাতে আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনগুলোর কিছু দেখাতে পারি।’ (ত্ব-হা ২০ : ২৩)

ফলে যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান এভাবে প্রত্যক্ষদর্শিতার সনদ প্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তাঁদের আয়নুল ইয়াকীনের (স্বচক্ষে দর্শনের) ঐ পর্যায় হাসেল হয়ে যায়। যার সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব নয়। যেমন শোনা কি দেখার মতো হয়। আর এই কারণেই নাবীগণ (আঃ) আল্লাহর পথে এমন সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন অন্য কেউ তা পারেন না। একারণে ঐ শক্তির পক্ষ থেকে আসা কোন প্রকার কঠোরতা কিংবা দুঃখ কষ্টকে তাঁরা দুঃখ কষ্ট বলে মনেই করতেন না।

এ মি’রাজের ঘটনার অন্তরালে যে সকল বিজ্ঞানময় এবং রহস্যজনক ব্যাপার রয়েছে তার আলোচনার স্থান হচ্ছে শরীয়ত দর্শনের পুস্তকাবলী। কিন্তু এমন কিছু তত্ত্ব রয়েছে যার দ্বারা এ বরকতময় সফরের স্রোতস্বিনী থেকে প্রবাহিত হয়ে নাবী (ﷺ)-এর জীবন উদ্যান অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে সে সব সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল,

পাঠকেরা দেখতে পায় যে, আল্লাহ তা‘আলা সূরাহ বণী ইসরাঈলে রাত্রি ভ্রমণের ঘটনা কেবলমাত্র একটি আয়াতে বর্ণনা করে কথার মোড় ইহুদীদের অন্যায় ও পাপকার্যের বর্ণনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এ কুরআন ঐ পথের সন্ধান দেয় যে পথ হচ্ছে সব চাইতে সোজা-সরল ও শুদ্ধ। কুরআন পাঠকেরা হয়তো সন্দেহ করতে পারে যে, কথা দুটির মধ্যে কোন মিল নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বরং আল্লাহ তা‘আলা এ বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইহুদীগণকে মানুষের নেতৃত্ব দেয়া থেকে বরখাস্ত করা হবে। কারণ তারা এমন সব অন্যায় করেছে যে, ঐ সকল কর্ম করার পর তাদেরকে ঐ পদে আর অধিষ্ঠিত রাখা সঙ্গত নয়। কাজেই এ পদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রদান করা হবে এবং ইবরাহীমী দাওয়াতের দুটি কেন্দ্রকেই তাঁর নেতৃত্বাধীনে স্থাপন করা হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, এখন এমন এক অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে যার ফলে আত্মিক নেতৃত্বের প্রসঙ্গটি এক সম্প্রদায়ের নিকট হতে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হস্তান্তর করা দরকার। অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায় যাদের ইতিহাস বিশ্বাস ঘাতকতা, খেয়ানত, আসাধূতা, অন্যায়, অত্যাচার ও অপকর্মে ভরপুর তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে অন্য এক উম্মত বা সম্প্রদায়কে দায়িত্বভার দেয়া দরকার যাঁরা প্রবাহিত হবেন কল্যাণ ও পুণ্যের প্রস্রবন হয়ে এবং যাঁদের নাবী (ﷺ) সর্বাধিক হেদায়েত প্রাপ্ত, সঠিক পথ প্রদর্শক ও আল্লাহর বাণী কুরআনের দ্বারা লাভবান হবেন।

কিন্তু যখন এ উম্মতের রাসূল (ﷺ) মক্কার পর্বত শ্রেণীতে মানুষের মাঝে ঠক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছেন তখন এ প্রত্যাবর্তন কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এটা একটা সে সময়ের প্রশ্নমাত্র, যে সময় এক অন্য রহস্যের আবরণ

উন্মোচিত হচ্ছিল। আর সেই রহস্যটি ছিল, ইসলামী দাওয়াতের একটি পর্যায় শেষ যার ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোন আয়াতে অংশীবাদীদেরকে খোলাখুলি সতর্ক করে ধমক দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

(وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِن بَعْدِ نُوْحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا) [الإسراء:16، 17]

‘‘আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার ‘আযাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই। ১৭. নূহের পর বহু বংশধারাকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, বান্দাহ্দের পাপকাজের খবর রাখা আর লক্ষ্য রাখার জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ’ [আল-ইসরা (১৭) : ১৬-১৭]

পক্ষান্তরে এ সকল আয়াতের পাশে পাশে এমন সব আয়াতও রয়েছে যার মাধ্যমে মুসলিমগণকে তাহযীব, তমদ্দুনের এমন সব নিয়ম-কানুন এবং প্রতিরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে নবাগত ইসলামী জিন্দেগীর ভিত্তি নির্মিত, নিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ় হতে পারে। মনে হয় মুসলিমগণ এখন এমন এক সরজমিনের উপর নিজ ঠিকানা বানিয়েছেন সেখানে সকল দিক দিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী আপন হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং সমাজ জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা এমন এক ঐকমত্য গঠনে সক্ষম হয়েছেন যার উপর ভিত্তি করে সমাজের যাঁতা ঘুরছে। অধিকন্তু, এ আয়াতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অচিরেই এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, যা সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এই নৈশ ভ্রমণ ও মি’রাজ বরকতময় ঘটনার তলদেশে হিকমত ও রহস্যসমূহের মধ্যে এমন একটি হিকমত যা আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য বর্ণনা উপযোগী মনে করে আমি এখানে তা লিপিবদ্ধ করলাম। এরকম দুটি বিরাট হিকমতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আমি এ ব্যাপারে মতস্থির করেছি যে, এ নৈশ ভ্রমণের ঘটনা ‘আক্বাবাহর প্রথম বাইআতের ঘটনার কিছু পূর্বের অথবা দু’বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা হতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা সব চাইতে ভাল জানেন।

ফুটনোট

[1] বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে দেখুন যা’দুল মা’আদ ২য় খন্ড ৪৯ পৃঃ মুকতাসারুস সীরাহ শাইখ আবদুল্লাহ পৃঃ ১৪৮-১৪৯। রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খন্ড ৭৬ পৃঃ।

[2] যা’দুল মা’আদ ২য় খন্ড ৪৭-৪৮ পৃঃ।

[3] যা’দুল মায়দ ২য় খন্ড ৪৭-৪৮ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৫০, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭০, ৪৮১, ৫৪৮, ৫৫০, ২য় খন্ড ৬৮৪ মসলিম ১ম খন্ড ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬।

[4] পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি, এ ছাড়া ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৩৯৭, ৪০২ ও ৪০৬ পৃঃ। তফসীরের কিতাব সমূহের সূরাহ

ইসরার তফসীর দ্রষ্টব্য।

[5] যা’দুল মাদ ১/৪৮ পৃঃ, এটা ছাড়া সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৬৮৪, সহীহুল মুসলিম ১ম খন্ড ৯৬ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১/৪০২-৪০৩ পৃঃ।

[6] ইবনে হিশাম ১/৩৯৯ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6136

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন